স্মৃতির আলোয়

নলিনী দাশ

''আমার কুয়াশাচ্ছন্ন কবিতা মেয়েদের ভালো লাগবে না - এই
বলে জীবনানন্দ দাশ আমাদের পত্রিকায় কবিতা দেননি''
—নলিনী দাশ।

প্রিয়জনের মুখে প্রিয়জনের কথা শুনবো এই ইচ্ছে আমার বহুদিনের। পূজাবকাশে একদিন সকালবেলা তাই বেরিয়ে পড়া গেল রাসবিহারী এভিন্যুতে 'সন্দেশ' অফিসের উদ্দেশ্যে। এই 'সন্দেশ' পত্রিকার কার্যালয়টি আসলে নলিনী দাশ ও কল্যাণী কার্লেকরের বাসভবন। এই দুই বোন নিজেরাই স্বনামধন্যা। এঁদের পারিবারিক পটভূমিকার গুরুত্বও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রায় ঐতিহাসিক বলা যায়। আমাদের এবারের উদ্দেশ্য শ্রীমতি নলিনী দাশের চোখে কবি জীবনানন্দকে পারিবারিক পটভূমিকায় দেখা। জীবনানন্দ দাশ বেশ কিছুদিন তাঁর ছোট ভাই অ—াকানন্দ ও তাঁর স্ত্রী নলিনী দাশের সঙ্গে কাটিয়েছেন, নলিনী দাশ খুব কাছ থেকে কবিকে দেখেছেন। তাই ওঁর কাছে কবিকে কবিতার বাইরে অন্তরঙ্গ জীবনে দেখতে পাবো এই আশা নিয়েই হাজির হয়েছিলাম— যদিও মনে মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল ওঁর ব্যস্ততার ফাঁকে সময় দিতে পারবেন কিনা। আমাদের ভয় যে অমূলক তা বোঝা গেল যখন উনি সানন্দে জীবনানন্দ দাশের কথা বলতে রাজী হলেন। আমাদের প্রশ্ন করতে বলাতে সোৎসাহে খাতা পেন্সিল হাতে করে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম।

প্রশ্ন : আপনি প্রথম জীবনানন্দর নাম ও কবিতার সঙ্গে কিভাবে পরিচিত হন?

উত্তর : আমি এম. এ. ক্লাসে পড়ি। বুদ্ধদেব বসু ঠাট্টা করে বলতেন— আমার পত্রিকার প্রথম গ্রাহিকা। কারণ আমার গ্রাহক সংখ্যা ছিল তিন। এক এবং দুই ছিল গ্রাহক। কবিতা পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশের কবিতা বেরুতো নিয়মিত প্রতি সংখ্যায়। তখন জীবনানন্দ দাশের কোন খ্যাতি হয়নি। কিন্তু আমরা পাঠিকারা তাঁর কবিতা নিয়ে খুব আলোচনা করতাম। একদিন শুনি কবির নিজের বোন সুচরিতা দাশ এম. এ. পড়েন আমাদের সঙ্গে অন্য বিষয়ে। তারপরই একদিন আমরা কয়েকজন দল বেঁধে সুচরিতা দাশের সঙ্গে আলাপ করে এলাম। আমি ও আমার দিদি কল্যাণী কার্লেকার 'মেয়েদের কথা' বলে একটি পত্রিকা বার করতাম। আমরা তখন জীবনান্দ দাশের কাছে একটি কবিতা চেয়ে পাঠাই। কিন্তু উনি আমাদের কবিতা দেননি। চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে ওঁর কবিতা কুয়াশাচ্ছন্ন, মেয়েরা ওঁর কবিতা পছন্দ করবে না সেইজন্য উনি মেয়েদের পত্রিকায় কবিতা দেবেন না। জীবনানন্দ দাশ তখন 'ধূসর পাণ্ডুলিপির'র কবিতা লিখছিলেন। এই সময়ে জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে শুধু চিঠিপত্রেই পরিচয় ছিল।

প্রশ্ন : প্রথম কবে কোথায় আপনি কবিকে দেখেন?

উত্তর : তহিক ছোট ভাই অশোকানন্দর সঙ্গে আমার ১৯৪৩ সালে বিয়ে হয়। বিয়ের পর আমরা ল্যান্সডাউন রোডে একটি বাড়ীতে থাকতাম। সেই বাড়ীতে দাদা ছুটিতে এসে থাকতেন। উনি তখন বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। এক সময় দীর্ঘদিন ছুটি নিয়ে আমাদের কাছে ল্যান্সডাউন রোড এসেছিলেন পত্রিকার কাজে। স্বরাজ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যার সম্পাদনা করেছিলেন বেশ কিছুদিন, সেই সময় খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল কবি জীবনানন্দ দাশকে। তারপর আমার স্বামী দিল্লী বদলি হয়ে গেলে আমি রাসবিহারীতে আমার বাবার বাড়ীতে উঠে আসি তখন জীবনানন্দ দাশ ঐ বাড়ীতে ছিলেন। সেই বাড়ীরই একতলার ফ্ল্যাটে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ছিলেন।

প্রশ্ন : নিকট আত্মীয় হিসেবে কবির সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

উত্তর : আমাকে উনি ভ্রাতৃবধুর চাইতে ছোট বোনের বন্ধু হিসাবেই দেখতেন। আমি সামান্য কিছু করলে খুব খুশী হতেন। বোন রেঁধে খাওয়ালে যেমন খুশী হতেন আবার আমি একটা সোয়েটার বুনে দিলেও তেমনই খুশী হতেন। দাদা লোকের সঙ্গে মিশতে পারতেন না। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও সমান হৃদ্যতা থাকত না। কিন্তু যদি কারুর সঙ্গে একবার মিশতেন তবে খুব আন্তরিকভাবেই মিশতেন। নির্জনতার কবি বলে ওনার নাম বা দুর্নাম বোধ হয় এই কারণে যে উনি প্রথমটায় কারও সঙ্গে মিশতে পারতেন না। কিন্তু যাঁরা ওঁর খোলস ভেদ করে ভেতরে পৌঁছুতে পারতেন তাঁরা খুব লাভবান হতেন। ব্যক্তিগত জীবনে ভাই ও বোনের সঙ্গে খুব হৃদ্যতা ছিল।

প্রশ্ন : কবির পারিবারিক বা ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : জীবনানন্দ একেবারেই অসাংসারিক লোক ছিলেন। যদিও তিনি দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলেন না কিন্তু সংসারে জড়িয়ে থাকার স্বভাব ছিল না—ছেলেমেয়েরা ভালো ভাবে পড়াশুনা করুক চাইতেন কিন্তু তিনি নিজে যে তাদের নিয়ে বসবেন তা কখনও করে নি। ওঁর স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন। উনি হাঁপানিতে কষ্ট পেতেন কিন্তু বি.টি. পড়েছেন চাকরী করেছেন। তবে বাড়ীর গৃহিণী অসুস্থ থাকলে সাংসারিক অসুবিধা তো দেখা দেবেই, সেই সাংসারিক অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়েছে কবিকে। স্ত্রী ও কবির জীবনে দৃষ্টিভঙ্গী একটু আলাদা ছিল। উনি কাজের মহিলা ছিলেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি জীবনে করেছেন। স্বামী সম্পর্কে ওর মনোভাব ছিল— তোমার এত বিদ্যে কিন্তু তমি রোজগার করতে পারো না। কেন? জীবনানন্দকে স্থায়ী চাকরির অভাবে কিছুটা অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে।

প্রশ্ন : অধ্যাপক হিসেবে কবি কেমন ছিলেন?

উত্তর : অধ্যাপক হিসেবে কবি প্রথমে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে ও পরে বিভিন্ন কলেজে কিছুদিন অস্থায়ী পদে কাজ

করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক হিসেবে প্রথম ওঁর সুনাম হয় হাওড়া গার্লস কলেজে এসে। যদিও মাত্র দু'বছর এখানে কাজ করতে পেরেছেন। ভালো অধ্যাপক মানে যদি এই হয় যিনি পরীক্ষা পাশের জন্য ঠিকমতো তৈরী করে দিতে পারে তো, তা কিন্তু উনি ছিলেন না। সাহিত্যের বোধ তৈরী করে দেওয়ার ব্যাপারে ওঁর খুব সুনাম ছিল। ক্লাস পড়ানোর চাইতে যে সব ছাত্রী ওঁর একটু কাছে আসতে পারতো তাদের নিয়ে সাহিত্যের আলোচনায় ওঁর জুড়ি ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় কবির সহকর্মী ছিলেন হাওড়া গার্লস কলেজে। অসিতবাবুর সঙ্গে কবির খুব হৃদ্যতা ছিল। শেষ কর্মজীবনে কবি খুব আনন্দ ও সুনাম পেয়েছিলেন।

প্রশ্ন : কবির নিজের দৃষ্টিভঙ্গী কী ছিল নিজের কবিতা, উপন্যাস উত্যাদি সম্পর্কে?

উত্তর : নিজের কবিতা সম্পর্কে কবি বেশ আশাবাদী ছিলেন। কতিার মধ্যেও আবার সব কবিতা পছন্দ করতেন না। 'রূপসী বাংলা'র কবিতা কবির একেবারেই অপছন্দ ছিল। উনি জীবিতকালে রূপসী বাংলা প্রকাশ করেন নি। ওঁর মৃত্যুর পর ভাই অলোকানন্দ ওটি প্রকাশ করেন। জীবিতকালে কবির কোন গল্প বা উপন্যাস বের হয়নি যদিও লিখেছিলেন মৃত্যুর প্রায় ২০ বছর আগে। কিন্তু যেহেতু নিজের গদ্য রচনা সম্বন্ধে ওঁর confidence ছিল না তাই উনি ওগুলো প্রকাশের জন্য কোনোদিন কোথাও পাঠাননি। মৃত্যুর পরেও ওঁর স্ত্রীও বহুকাল ওঁর গদ্য ছাপার অনুমতি দেননি। জীবনানন্দ নিজে কোনও উপন্যাসের নামকরণ করে যাননি। অশোকানন্দ প্রথম 'মাল্যবান' প্রকাশ করেন। দেশ পত্রিকায় 'সুতীর্থ' ধারাবাকি ভাবে বেরোয় তারপর বেঙ্গল পাবলিশার্স বই হিসেবে প্রকাশ করেন। প্রতিক্ষণ যখন ওঁর অপ্রকাশিত লেখা ছাপার অনুমতি চাইল তখন আমরা কনট্র্যাক্ট দিলাম (এখন তো সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ওঁর গল্প উপন্যাস কিরকম বলিষ্ঠ ওঁর কবিতার মতোই।)

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয়না যে এখনকার কবিরা যেরকম স্বীকৃতি পাচ্ছেন জীবনানন্দ দাশ তাঁর জীবিতকালে এদের তুলনায় কিছুই পাননি?

উত্তর : জীবনানন্দ প্রথমদিকে খ্যাতি পাননি ঠিকই— তিনি নিজে পাবলিসিটি করতে পারতেন না, নিজের ঢাক নিজে পেটাতে জানতেন না, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কবি তিনি ছিলেন না। লেখক গোষ্ঠী বা সমাজতন্ত্রী অন্য কোন গোষ্ঠীভূক্ত হতে তিনি পছন্দ করতেন না। তবু সিগনেট প্রেস ও বুদ্ধবে বসুর মাধ্যমে তিনি খ্যাতি পেয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুই প্রথম কবিতা ছেপে টাকা দেয়। রবীন্দ্র পুরস্কার তিনি জীবিত অবস্থাতেই পান। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পর থেকেই তাঁর খ্যাতি বেড়ে যায় ও বই বিক্রীও বেড়ে যায়। তাঁর ছেলে মেয়ে এখনও রয়্যালিটি পাচ্ছে। তাঁর বই থেকে আজ যে আয় হয় তার এক দশমাংশ জীবিত অবস্থায় পেলে তাঁকে চাকরি করে, এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে হতো না। স্থায়ী চাকরির অভাবে কষ্টও পেতে হতো না। তবে যৌথ পরিবার থাকাতে অর্থকষ্ট তেমন না থাকলেও মনোকষ্ট তো ছিলই, সচ্ছলতা কোনদিনই জীবিতকালে পাননি। নিজে যদি প্রচারবিমুখ না হতেন তবে জীবিতকালেও অনেক খ্যাতি পেতে পারতেন।

[আমরা তো দেখছিই এই প্রচারের যুগে নিকৃষ্ট মানের জিনিসও কিরকম রম্‌রম্‌ করে বাজারে চলছে! অতএব যেন তেন প্রকারেন প্রচার চাই-ই। জীবনান্দ দাশের মত মনে প্রাণে খাঁটি কবি এখন কোথায়?]

—[ফেব্রুয়ারী '৮৮: জলপ্রপাত - ২৯ সংখ্যা থেকে]
লিখেছেন শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়।